চার্লস রবার্ট ডারউইন

গৌরী মিত্র

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

প্রায় সারাটা জীবন নিবেদিতপ্রাণ হয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডারউইন প্রকৃতি তথা জীবকুল নিয়ে গবেষণা করে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ডারউইনের গবেষণামূলক কাজ, তাঁর আবিষ্কৃত বিবর্তনতত্ত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অবহিত। বিবর্তনতত্ত্বের আবিষ্কর্তা ডারউইন—এ খবর অনেকেই জানেন— কিন্তু তাঁরা হয়তো জানেন না— বিজ্ঞানী ডারউইনের গবেষণামূলক কাজের পরিধি কত বিস্তৃত ছিল কত বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ডারউইনকে প্রকৃতি তথা সত্যের অন্বেষণ করতে হয়েছিল।

জীবনবিজ্ঞানের পাঠক্রমে পৃথিবীর জন্ম, পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব জীবের জীবনচক্র ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত করে তোলার জন্যে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কিশোর ছাত্রছাত্রীদের বলেন বিবর্তনতত্ত্বের কথা। এ সময়ে স্বতই এসে যায় বিবর্তনতত্ত্বের আবিষ্কর্তা ডারউইনের নাম। ডারউইনের বিজ্ঞান-সাধনার কথা বিস্তৃত ভাবে ছাত্রছাত্রীদের জানানো সম্ভব হয় না ক্লাসের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব-সূত্র, সংজ্ঞা ইত্যাদির মধ্যে বিজ্ঞানীকে পাওয়া যায় না। যেমন কবিকে পাওয়া যায় না তাঁর লেখা কবিতায়। ডারউইনের মতো সাধক-বিজ্ঞানীদের জীবনে থাকে কত মহান আদর্শ। যে

আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে কিশোর-কিশোরীরা স্বতই বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে। হয়তো আগামী দিনে প্রকৃতি তথা প্রাণী-উদ্ভিদ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে তারা গবেষণার কাজে মেতে উঠবে— আবিষ্কার করতেও পারে কোনও তত্ত্ব।

এমনতর ভাবনায় উদবুদ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী ডারউইনের জীবনী-গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে রচনার কাজে এগিয়েছি। এ গ্রন্থ যদি পাঠকদের বিজ্ঞানী ডারউইনের জীবন আদর্শে প্রাণিত করে তাহলে আমার প্রয়াস সর্বার্থসার্থক হবে।

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০০৯

গৌরী মিত্র

॥ ১ ॥

প্রকৃতি-পাঠশালা! এ পাঠশালার অবস্থান বিশ্বজুড়ে। আকাশ, মাটি, জল, উদ্ভিদ, প্রাণী— সবই প্রকৃতি পাঠশালার অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্ভুক্ত এই সব বিষয়কে সঠিক মাত্রায় জেনে বুঝে প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির স্বরূপকে জানার চেষ্টা করেন।

চেনাজানার জন্যে বিজ্ঞানীদের নিতে হয় সক্রিয় ভূমিকা। বই পড়ে, লোকের মুখে শুনে নয় বিজ্ঞানীরা নিজের চোখে দেখে শনাক্ত করেন প্রকৃতির সব অবস্থানকে। দেখার পর চলে পরীক্ষানিরীক্ষা।

প্রকৃতির বৈচিত্র্য— গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের রহস্য জানার জন্যে যে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন [1809-1882 খ্রিস্টাব্দ]।

ইভোলিউশন থিয়োরি মানে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা

হিসেবে ডারউইনের নাম এখন অনেকেই জানেন। কিন্তু এ ছাড়াও প্রকৃতি-বিষয়ক নানা তথ্য উদ্ধার করেছেন ডারউইন। বিলাতের অর্কিডের পরাগসংযোজন, কেঁচোর ওপর গবেষণা, পতঙ্গভূক উদ্ভিদের জীবনকথা, উদ্ভিদের সাড়া দেওয়া, মানুষ ও অন্য প্রাণীদের মানসিক প্রবৃত্তির তুলনা— এবংবিধ বিষয়ে ডারউইনের লেখা বইগুলি সুখপাঠ্য তো বটেই— বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধও। তবে যে বইটি ডারউইনকে স্মরণীয় করেছে সে বইটির নাম 'অরিজিন অব স্পিসিজ'। 1859 সালে এই বইটি প্রকাশ পেলে বিজ্ঞানী, শিল্পী, দার্শনিক, বণিক নির্বিশেষে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ ইভোলিউশন থিয়োরি অর্থাৎ বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অবহিত হন।

'অরিজিন অব স্পিসিজ'—এই বইটিতে অজস্র দৃষ্টান্তের সাহায্যে ডারউইন বিবর্তনবাদ তথা ক্রমবিকাশের সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

এ বইটি পড়ে মানুষ জানতে পারল— জগৎ জুড়ে সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের যে লীলা সংঘটিত হচ্ছে তার মূলে আছে একটি সূত্র বা নিয়ম। নিয়ম-—অর্থাৎ বিবর্তন-নিয়ম। এক সময়ে মানুষের ধারণা ছিল— মানুষ ও অন্যান্য সব জীব বুঝি এই পৃথিবীতে বাস করছে সৃষ্টির প্রথম দিনটি থেকেই। সৃষ্টিলীলা সম্পর্কে সব জনজীবনেই আছে পুরাণতত্ত্ব— যাতে বলা হয়েছে যে মানুষ ও অন্যান্য সব জীব হল ঈশ্বরের সৃষ্টি।

মানুষ যে মানুষেতর কোনো জীব থেকে জন্মাতে

পারে— এমন কথা এক সময়ে ভাবাও ছিল পাপ। এ প্রসঙ্গে খ্রিস্টীয় যাজকদের সৃষ্টিলীলা সম্পর্কে যে ধারণা অতীতে দীর্ঘকাল বহাল ছিল তার কথা খানিকটা শোনা যাক।

চার্চ-খ্রিস্টধর্মীয় এই প্রতিষ্ঠানের যাজকরা গোঁড়ামির বশে ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর তত্ত্বকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর তা প্রচার করেছিলেন জনসমাজে। সমাজের প্রায় সব মানুষ তত্ত্বটিতে একান্তভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বাসী না হয়েও উপায় ছিল না কোনো। কেন? অবিশ্বাসী হলে যাজকদের কুনজরে পড়তে হত; কপালে শাস্তিও জুটত।

শোনা যাক বাইবেল তত্ত্বটি সংক্ষেপে—

মানুষ ও অন্যান্য সব জীবের সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রত্যেকটি জীবকে আলাদা ভাবে সৃষ্টি করেছেন। সব জীবের মধ্যে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ। মানুষের আদিপিতা, আদিমাতা হলেন যথাক্রমে আদম, ইভ। ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে ধ্বংস করেন যখন পৃথিবী পাপে ভরে ওঠে। ঈশ্বরের নির্দেশেই মহাত্মা নোয়া নৌকো তৈরি করেন ও সে নৌকোয় শুধু পবিত্র, শুদ্ধ প্রাণীদের ঠাঁই দেন। উত্তরকালে এই পবিত্র-প্রাণীদের ভূমিকাতে নতুন জীবজগৎ গড়ে ওঠে।

॥ ২ ॥

মাটি, সমুদ্র, আবহাওয়া— পৃথিবীর কিছুই চিরকাল একরকম থাকে না। জীবজগতে ভাঙাগড়ার চলছে নিয়ত। একযুগের জীব অন্য যুগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। জলের জীব ডাঙায় উঠে আসছে— ডাঙার জীব আকাশে উড়ছে। একই জাতের জীবের মধ্যে সময়ভেদে, স্থানভেদে চেহারার অদলবদল ঘটছে। এবংবিধ ব্যাপারগুলো বিশৃঙ্খল নয়; সব কিছুর মূলে আছে শৃঙ্খলার একটি সূত্র— এ ভাবনায় কিছু মানুষ উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাঁরা খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন শৃঙ্খলার সূত্রটিকে।

জীবজগতের ক্রম বিবর্তনের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করে ডারউইনই শৃঙ্খলার সূত্রটিকে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে সূত্রটিকে যথাযথভাবে প্রমাণও করেছিলেন।

ধর্ম তথা ভাববাদী ভাবনা নয় বাস্তববাদী ভাবনায়

উদবুদ্ধ হয়ে জীবজগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় সম্পর্কে কিছুটা ইতিবাচক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের মধ্যে একজন হলেন জর্জ ক্যুভিঁয়ের (1769-1832)

ডারউইনের পূর্বজ ফরাসি বিজ্ঞানী ক্যুভিঁয়ের জীবের আবির্ভাব, অস্তিত্ব, বিলুপ্তি— ইত্যাদি ঘটনার কারণ জানার জন্যে জীবন্ত প্রাণী, ফসিলে পরিণত প্রাণী মানে প্রাণীর কঙ্কাল, হাড়গোড় ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছিলেন। গবেষণা, পরীক্ষানিরীক্ষা করে ক্যুভিঁয়ের বলেছিলেন—

এই জগৎকে আশ্রয় করে জীব নানা রূপে আবির্ভূত হচ্ছে। জীবের রূপের বদল হচ্ছে। —এ সব ঘটনার মূলে আছে একটি নিয়ম।

নিয়মের কোনো রূপরেখার কথা ক্যুভিঁয়ের বলতে পারেননি। তবে কেন পৃথিবীর মাটি থেকে কিছু জীব— কিছু জীবের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে— এ প্রশ্নের উত্তরে ক্যুভিঁয়ের বলেছেন—

বন্যা, অতিবন্যা, ভূমিকম্প— এক কথায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জীবের মৃত্যু ঘটে। জীবের প্রজাতিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পৃথিবী থেকে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও কি করে কিছু জীব— ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবও টিকে থাকে?— এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না ক্যুভিঁয়ের -এর তত্ত্বে।

ক্যুভিঁয়ের-এর আগে জীবজগতের বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ছিলেন সুইডেনের এক বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীর নাম— ক্যারোলাস লিনিয়াস (1707-1778)—